#মনাকাশে_ধ্রুবতারা_বেশে
#ইসরাত_জাহান_দ্যুতি
৩৪.

৮ মার্চ
ফরিদপুর সদর স্টেডিয়াম
বিকাল ৫ টা

উন্নয়ন মেলা আরম্ভ হয়েছে গত দুদিন হলো। পরিবেশটা বেশ জমজমাট, রঙিন আর প্রাণবন্ত। চারপাশে স্থানীয় খাবারের গন্ধ, কচি-কাঁচা ছেলেমেয়ের হাসাহাসি, লোকজনের আনাগোনা—প্রচণ্ড ভিড়। রাত হলে আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে দোকানগুলো। এটি জেলা প্রশাসন কতৃক আয়োজিত মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য বড়ো একটা মঞ্চ করা হয়েছে। শাকিবুল হক ছিলেন এ মেলার উদ্বোধক। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরা, জনসচেতনতা তৈরি, স্থানীয় সাংস্কৃতিক চর্চা উজ্জীবিত করায় এ মেলার উদ্দেশ্য।

নানান ধরনের দোকানের মাঝে হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, জামদানি বা তাঁতের কাপড়ের তৈরি কিছু দোকান বসেছে আর ডিজিটাল সেবা বা প্রযুক্তি বিষয়ক প্রদর্শনীও রয়েছে। সেসবের গল্প শুনে জারা আজ মেলায় ছুটে এসেছে প্রিয় দুই বান্ধবীর সঙ্গে। তাছাড়া আরও একটি কারণ আছে। সেটা বাড়িতে জানানোর সাহস হয়নি। এমনিতেই আসার অনুমতি নিতে গিয়ে আজ গোটা দিন না খেয়ে, ঘরে বসে কান্নাকাটি করতে হয়েছে। তারপরও বাবা অনুমতি দিলেও ভাইয়ের অনুমতি পেলই না। তাই ভাইকে না জানিয়েই বাবার কঠোর নির্দেশে বাড়ির গাড়িতে করে আসতে হয়েছে। ড্রাইভার চাচা খালিদ—অনেক পুরোনো আর বিশ্বস্ত মানুষ তিনি। অনেকটা জোবেদা খালার মতোই কাছের সম্পর্ক তার সঙ্গে হক বাড়ির। জারা তাই হাজারবার বলেও তাকে নিজের পিছু ছাড়াতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তাকে, তা সে অক্ষরে অক্ষরেই পালন করবে। তাতে জারা রেগেমেগে, চিৎকার-চেঁচামেচি করলেও কিছু মনে করবে না সে। তবে চিৎকার-চেঁচামেচির বদলে জারা করল পাগলামি। খালিদের চোখের সমস্যা হয়েছে ইদানিং। সময় করে ডাক্তারের কাছে যাওয়া হচ্ছে না তার। স্বাস্থ্য ক্যাম্পের সামনে গিয়ে হঠাৎ তার হাত চেপে ধরল সে আর বলল এক ডাক্তারকে, "এই যে ভাইয়া, শুনুন। আমার আঙ্কেলের চোখটা পরীক্ষা করা দরকার। জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি। কারণ, সে ভাবছে আপনারা টাকা নেবেন। আপনারা কি সত্যিই টাকা নেবেন?"

ক্যাম্পের ভেতরে থাকা সবাই হাসল। "একদম ফ্রি ট্রিটমেন্ট, আপু", বলল একটি ছেলে, "কোনো টাকা লাগবে না।"

নাস্তানাবুদ অবস্থা খালিদের। বিব্রত স্বরে জারাকে বলল, "আমি এহনে কোনো পরীক্ষা টরিক্ষা করব না, আম্মা। মধুখালী চক্ষু হাসপাতালে যাইয়ে করবানে একবারে।"

"সে যেদিন মধুখালী যাওয়ার সেদিন যাবেন আপনি। আজকে ফ্রিতে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ যেহেতু পাচ্ছেন তাই এখনই পরীক্ষা করতে হবে।" জেদি জারা জোর করেই তাকে ডাক্তারগুলোর কাছে গছিয়ে দিয়েই দিল দৌড়। বান্ধবীদের কাছে এসে তাদের বলল, "তাড়াতাড়ি কল দে হাসিবকে। জলদি আসতে বল।"

জারার নিজস্ব ফোন থাকলেও তা সর্বক্ষণ কাছে রাখার অনুমতি নেই। মায়ের হাওলাতেই থাকে সেটা। বাড়িতে দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত তাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হলেও বাড়ির বাইরে ফোন নিয়ে আসা একেবারেই নিষেধ। একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্টও ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে সে। তাও সেটার অ্যাক্সেস শারফানের কাছেও রয়েছে। কিন্তু বান্ধবীদের পাল্লায় পড়ে চুরি করে আরেকটা অ্যাকাউন্ট খুলেছে জারা। যেটাতে নাম, পরিচয় বদলে অনেকের সাথেই যুক্ত হয়েছে সে। এমনভাবে মাস দুই আগে পরিচয়

হয়েছে একটি ছেলের সাথে। সে-ই হাসিব। তার মতোই এইচএসসি পরীক্ষার্থী। মধুখালীতে থাকে, সেখানের কলেজেই পড়ে। টুকটাক কথাবার্তা হতে হতে এখন ভালো বন্ধুত্ব ওদের। আর জারার মাধ্যমেই জারার বান্ধবীদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়েছে কিছুটা। গতকাল হাসিব জানিয়েছে সে ফরিদপুর মেলাতে ঘুরতে আসছে আজ। যদি সম্ভব হয় তাহলে জারার সঙ্গে দেখাও করবে। ছেলেটা পড়াশোনায় খুব মেধাবী, কথাবার্তা আর আদবকায়দাতেও খুব মার্জিত। তবে জারার থেকে বয়সে একটু বড়ো। তার পড়াশোনা ছিল প্রথমে মাদ্রাসাতে। সেখানে হাফেজি পাশও করেছিল। তারপরই স্কুলে ভর্তি হয় হঠাৎ। আর এজন্যই কিছুটা পিছিয়ে বয়স অনুযায়ী।

ফেসবুকে যতটুকু কথা বলার সুযোগ হয় ওদের, তা বেশিরভাগ সময় হয় পড়াশোনার ব্যাপারেই। অনেক সাজেশনও দেওয়া-নেওয়া হয় দুজনের মধ্যে। সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজে পড়ায় কখনো কোনো ছেলে বন্ধু হয়নি জারার। এজন্যই হাসিবের সঙ্গে বন্ধুত্বটা একটু বিশেষ। তবে সেটা প্রেমমূলক কিছু নয়।

হাসিবের সঙ্গে মেসেঞ্জারে কথা বলল জারার বান্ধবী রেখা। কথা শেষে জারাকে বলল, “ছেলে মানুষ এত লাজুক হয় জানতাম না। মেসেজে যাওবা একটু আধটু কথা বলত। কলে তো ঠিকমতো কথায় বলতে চাইল না। ও বোধ হয় আসবে না আমাদের সামনে। কারণ, ও তোর সঙ্গে যতটা ফ্রেন্ডলি ততটা আমাদের সাথে না। তাই লজ্জা পাচ্ছে আসতে।”

“আজব”, বিরক্ত হলো জারা, “লজ্জার কী আছে বুঝলাম না। কোথায় ও?”

“তা বলল না। চলে যাবে বলল।”

“এত যুদ্ধ করে আসলাম ওর জন্য! আর ও দেখা না করেই চলে যাবে? এটা কোনো কথা?” রাগ হলো জারার খুব, “লজ্জা না ছাই! ভাবের চোটে তামাশা লাগিয়েছে বেয়াদবটা। দেখছে তিন তিনটা মেয়ে দেখা করতে এসেছি ওর সঙ্গে। কল লাগা তো। গালাগালি দেব আমি।”

এদিকে মেহার জোরাজুরিতে সানাও আজ এসেছে। সঙ্গে দিনা আর দিনার বরও আছে। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের দোকানের মাঝে একটা দোকান দিনার এক দূর সম্পর্কের ননদের। তার দোকানে বসেই আড্ডায় ব্যস্ত ওরা। কিন্তু মেহার ঠেলাঠেলিতে বসে থাকা সম্ভব হলো না সানার। বোনকে নিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। ঘুরতে ঘুরতে মেহার দেখা হয়ে গেল তার এক বান্ধবীর সাথে। সানাকে বলল, “তুই স্টলে গিয়ে বসলে বস, আপু। আমি আর শিফা এক্সিবিশনগুলো দেখে আসি?”

কঠিন চোখে বোনের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর অনুমতি দিল সানা, “আমার ফোনটা নিয়ে যা। দিনার ফোন থেকে কল করার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হবি।”

“দে দে”, খুশিই হলো মেহা, “কয়টা সেলফি নিতে পারব।”

সানা যদিও ফিরল না দোকানে। হস্তশিল্প আর শাড়ির দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকল। এর মাঝেই চোখ পড়ল জারার ওপর। কিছুটা দূরেই বান্ধবীদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে মুখটা ভার করে। রেগে আছে বোধ হয় কোনো কারণে। কিন্তু রাগলেও মেয়েটাকে বেশ মিষ্টি লাগে তো!

তবে জারাকে দেখে জারার ভাইয়ের ব্যবহারের কথা মনে পড়ে গেল সানার। সেদিনের কষ্টের ছাপটা বিবর্ণ হয়নি এখনো কেন যেন। অতীতে কত কিছুই তো হলো তার সঙ্গে। কিন্তু কখনো এমন মনঃকষ্ট অনুভব করেনি সানা। খানিকটা অভিমানও মিশে আছে তাতে। সেটা অবশ্য বোধগম্য হচ্ছে না ওর। আর এ অভিমানই অটল করে রেখেছে ওর কষ্টটাকে।

শারফানের কথা মনে পড়ে একটু উদাসীনের মতো হলো সে। সেদিন কলটা কেটে দেওয়ার পর যোগাযোগ হয়নি আর ওদের। যোগাযোগ শারফান করতে চাইলেও সে আর সাড়া দিত কিনা সন্দেহ। ভবিষ্যতেও আর কোনোরকম দেখা-সাক্ষাৎ, কথা না হোক, এমনটাই চায় সে। কিন্তু এ চাওয়া তো কতবারই চাইল আজ অবধি। কখনোই তা পূরণ হয়নি। এবারও হবে কিনা কে জানে!

মাটিতে চোখ রেখে হাঁটতে হাঁটতে দিনার ননদের দোকানের দিকে এগোল সানা। অপ্রত্যাশিতভাবে তখনই ধাক্কা খেল একটি ছেলের পিঠের সঙ্গে। ওর থেকে কিছুটা সামনেই ছিল ছেলেটা। হাঁটছিল সেও। হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে পড়লে সানা খেয়াল না করায় ধাক্কাটা খেতে হলো। ব্যাপারটা খুব বিব্রতকর। সাদা পাঞ্জাবি পরা ছেলেটা। লজ্জা পেয়ে তার মুখটাও দেখল না চোখ তুলে। “সরি, ভাইয়া”, নিচু স্বরে বলেই কেটে পড়তে চেষ্টা করল।

কিন্তু হলো না। পেছন থেকে হঠাৎ ডেকে উঠল ছেলেটা, “অ্যাই সানা আপু?”

থমকে গিয়ে বিস্ময়ে পেছন ফিরে তাকাল সানা। ছেলেটাকে দেখে বিস্ময়ের মোড় এবার বদলাল ওর, “হাসিব, তুমি? কী খবর রে, ভাই? ফরিদপুর ঢুকলে কবে?”

“এইতো আপু আজই”, অপ্রতিভ হেসে বলল হাসিব, “কেমন আছেন? আঙ্কেল, আন্টিও আসছে?”

“আরে না। মেহা আর দিনার সঙ্গে এসেছি। তুমি কি একাই? না বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে?”

“একাই, আপু। এইতো চলে যাব এখনই।”

“চলে যাবে কেন? বাসায় চলো। আব্বু আম্মুর সঙ্গে দেখা করে আজকে থেকে যাও।”

“না, আপু। সামনে পরীক্ষা তো। পড়া মিস যাবে তাইলে।”

“তাও ঠিক। তা চলো, দিনা আর মেহার সাথে দেখা করবে।”

“আজকে থাক, আপু। আসব আরেকদিন।”

হাসিবকে দেখাচ্ছে বেশ চিন্তিত। মুখটা উৎকণ্ঠিত আর সাংঘাতিক ঘামছেও ছেলেটা। তা খেয়াল করে কেমন খটকা লাগল সানার। মধুখালী থেকে ফরিদপুর মেলা দেখতে এসেছে, তাও আবার একা একা! এটা অদ্ভুতই লাগল ওর। সন্দেহ করল কিছু একটা হয়েছে ছেলেটার। কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছে না-কি? প্রেমঘটিত কোনো বিষয় হবে হয়ত। দেখতে-শুনতে ভালোই ছেলেটা। লোকে তার চেহারাটাকে বলে নূরানি চেহারা। প্রেম করা অস্বাভাবিক কিছু না।

সম্পর্কের খাতিরে হাসিবের বাবা মোস্তফা সাহেবের চাচাত ভাই হয়। আপন না চাচাত ভাই না যদিও। কিন্তু সম্পর্ক অটুট আছে বিধায় হাসিবের পরিবার ওঠা-বসা করে সৈয়দ পরিবারগুলোতে। ভীষণ গরিব হাসিবের পরিবার। অন্যের মাঠে চাষাবাদ করে জীবিকা চালায় হাসিবের বাবা। বউ আর তিন ছেলে-মেয়ের ভরনপোষণ বহন করা কষ্টসাধ্যই হয়ে যায় তাতে। তাই সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রায়ই আসতে হয় তাদের সানার বাবা-চাচাদের কাছে।

হাসিবের বয়সটা সানার বয়সের কাছাকাছিই। কিন্তু তবুও সে আপু বলেই সম্বোধন করে এসেছে শৈশব থেকে। এমনকি মেহাকেও ছোটো আপু বলে ডাকে সব সময়। আপু ডাকার জন্য আবার সানাও ছোটো ভাইয়ের মতোই ভাবতে বাধ্য হয় তাকে। এ মুহূর্তে তার ভাবভঙ্গি দেখে তাই অকপটেই সে জিজ্ঞেস করে বসল, “কী ব্যাপার, হাসিব? নার্ভাস লাগছে কেন তোমাকে? দেখা করতে এসেছ না-কি কারও সাথে?”

বেশ লজ্জা পেল হাসিব। সে বাস্তবিকই লাজুক প্রকৃতির ছেলে। “তেমন কিছু না, আপু”, বিব্রতপূর্ণ হেসে ইতিউতি করল।

যা বোঝার বুঝে গেল সানা। অবাক হয়ে বলল, “তুমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারো সত্যি? জীবনে তো আমাদের সঙ্গেই ‘কেমন আছেন’ ছাড়া আর কিছু বলতে পারোনি।”

ঠোঁট চেপে বিব্রত চেহারাটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে থাকল হাসিব। সানা তাই আরও চেপে ধরল, “মেয়েটা কে, হ্যাঁ? এসেছে নিশ্চয়ই? বলো বলো… তাড়াতাড়ি বলো। নাহলে মেহাকে ডাকলে একদম ঘাড় চেপে ধরে কথা বের করবে।”

“এই না আপু”, তড়িঘড়ি করে বলল হাসিব, “ছোটো আপুকে ডেকেন না।”

মেহা তাকে খুব খ্যাপায় এত লাজুক প্রকৃতির হওয়ার কারণে। বাসায় গেলে মেহার খ্যাপানোর জ্বালাতেই অস্থির হয়ে পড়ে সে। তাই বেশ ভয়ই পায় মেহাকে।

“তাহলে বলো, মেয়েটা কে? দেখা করা শেষ না-কি?”

ইতোমধ্যে জারার বকুনি খাওয়া শেষ হাসিবের। সেই বকুনি খাওয়ার পর আর দেখা হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দেখা না করলেও তো চলবে না। এবং সেটা সে একাকীই করতে চায়। সানার সহযোগিতা নেবে না-কি? চিন্তা করল হাসিব। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার সময়ও নেই। তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল—সানার মাধ্যমেই দেখা করার চেষ্টা করবে। না পারলে আর কিছু করার নেই। চলে যাবে তারপর।

জারার কথা একটু খুলেই বলল হাসিব সানাকে। জারা বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে চায় বলেই সে সাহস পায়নি দেখা করার। এ কথা বলে হাসিব জানাল, “আপনি যা ভাবছেন এমন কিছু না আসলে, আপু। এমনিই ফ্রেন্ডশিপ আরকি। যদি একটু ম্যানেজ করেন ওকে, একটা চিরকুট দিতাম আপনার কাছে। ওকে গিয়ে দিয়ে আসতেন শুধু।”

“ছবি আছে জারার?” কপাল কুঁচকে বলল সানা, “ছবি থাকলে একটা ছবি দাও তো দেখি।”

মূলতঃ জারার নাম আর সে এইচএসসি পরীক্ষার্থী শুনে সানা সংশয়ে পড়ল শারফানের বোনই কিনা সে। তাছাড়া এই মুহূর্তে মেলাতে তো জারাও আছে।

“ছবি তো নাই, আপু। জারার বান্ধবী ছবি আপলোড করেছিল ওদের। তখন দেখেছিলাম শুধু। সেটা দেখাব?”

“দেখাও।”

হাসিব রেখা মেয়েটার ফেসবুক আইডিতে ঢুকে ছবিটা খুঁজে বের করল। দেখাল সানাকে। জারাকে দেখে অনেকটাই অবাক হলো সে। এতক্ষণ যতখানি মজা করছিল তা দূর হয়ে গম্ভীরতা ভর করল ওর মাঝে। জিজ্ঞেস করল শক্ত কণ্ঠে, "তোমাদের মধ্যে সত্যিই কোনো সম্পর্ক নেই, হাসিব? সত্যিটা বলো আমাকে।"

ঘাবড়ে গেল হাসিব। এমনিতেই টেনশনে অস্থির অবস্থা তার। সানার অভিব্যক্তি দেখে আরও বেশি টেনশন বেড়ে গেল। মাথা নাড়িয়ে বলল ব্যাকুল স্বরে, "ভালো ফ্রেন্ডশিপ শুধু। আর কোনো সম্পর্ক নেই, আপু। সত্যি। আল্লাহর কসম।"

"কখনো এমন প্রস্তাব যদি দেয়ও জারা। তাও রাজি হইয়ো না, ভাই", কোমল গলায় বলল সানা, "সিনেমার ডায়ালগের মতো বলতে হচ্ছে, ওদের ফ্যামিলির মান-মর্যাদা আর টাকা-পয়সার সঙ্গে আকাশ-পাতাল দূরত্ব তোমাদের। আর ওর ভাইটাকে চেনো?"

"সেভাবে না।"

"খুব ডেঞ্জারাস সে। কিন্তু বোনকে খুব ভালোবাসে। সীমার মধ্যে থেকেই কথা বোলো দুজন।"

"জারার দিক থেকেও কিছু নেই, আপু। আপনার সতর্কতার পর আমি ইনশা আল্লাহ আরও সাবধান হব।"

"এখন বলো, দেখা করতে চাইছ?"

দৃষ্টি নুইয়ে ফেলল হাসিব, "আপনি না বললে করব না।"

"তোমার ইচ্ছে, ভাই। আমার বলা, না বলার কথা আসছে না এখানে।"

সত্যি বলতে হাসিবের একটুও আগ্রহ বা সাহস, কোনোটাই হচ্ছে না জারার সঙ্গে দেখা করার। কিন্তু না করে যে উপায়ও নেই। এদিকে সানাকে বেশ মান্য করে বলে কিছু বলতেও পারল না। নীরবই রইল। আর তার নীরবতায় জবাব দিল সানাকে। জিজ্ঞেস করল সানা, "চিরকুটে কী লিখবে?"

"জারা আমাকে ভুল বুঝছে, আপু। ভাবছে আমি বেশি ভাব নিচ্ছি বলে দেখা করিনি ওর সাথে। ওর বান্ধবীদুটো খুব চঞ্চল তো। আমার আসলে একটু অস্বস্তিই হচ্ছে ওদের সামনে যেতে। জারা যদি চায় তাহলে নিজেই এসে কোথাও একটা দাঁড়িয়ে কথা বলে যাবে। আর না চাইলে সমস্যা নেই। চলে যাব আমি।"

হাসিবকে ছোটো থেকে চেনেই বলে সানা জানে বাবা-মায়ের বেশ বাধ্য সন্তান সে। অভাব-অনটন তার দুটো বোনের থেকেও বেশি ভালো বোঝে সে-ই। তাই কাজ করার মতো সামর্থ্যবান হওয়ার পর থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি রাজমিস্ত্রীর কাজ করে শুরু করে। কেবল নিজের পড়াশোনার খরচ আর সংসারের খরচ কিছুটা বহন করার জন্যই। এতে কখনো পড়াশোনাতেও গাফিলতি করেনি সে। মোস্তফা সাহেব সব সময় হাসিবের অধ্যবসায় আর পরিশ্রমের প্রশংসা করেই ওদের দু বোনকে অনুপ্রাণিত করেন। এমন ছেলের নিশ্চয়ই বাস্তবতার বুঝটাও থাকবে বলেই বিশ্বাস সানার।

কিন্তু জারা যে হাসিবের সঙ্গে দেখা করতেই বান্ধবীদের নিয়ে মেলায় এসেছে, সেটা জেনে সানার সন্দেহ হচ্ছে জারার ভাবমূর্তির ব্যাপারে। কথা বলতে পারলে আরেকটু পরিষ্কার হওয়া যেত। তাই রাজি হলো হাসিবকে সাহায্য করতে। একটা দোকান থেকে এক টুকরো কাগজ যোগাড় দুটো লাইন কথা লিখে দিল হাসিব। চিরকুটটা নিয়ে আপাতত তার থেকে বিদায় নিয়ে সানা চলে গেল জারাকে খুঁজতে। এই ফাঁকেই মেলা থেকে বেরিয়ে পড়ল হাসিব। মনে মনে খুব প্রার্থনা করল, দেখা করতে যেন রাজি না হয় জারা।

ড্রাইভার খালিদের চোখের পরীক্ষা শেষ। জারাকে খুঁজে বের করে তার কাছে যেতে উদ্যত হতেই হঠাৎ একটা ছেলে এল তার কাছে। তাকে জানাল, বাইরে পার্ক করে রাখা গাড়ির জানালার কাচ নাকি ভেঙে ফেলেছে দুটো ছেলে। খালিদ জিজ্ঞেস করল, "তুমি জাইনলে ক্যাম্বা আমার গাড়ি?"

"আপনারে ওই গাড়ি থেইকে নামবার দেখছিলাম কইয়াই তো আপনারে খুঁইজে কবার আসলাম। পোলা দুইডা এহনো আছে। ধরবার চালি যান এহনই", বলল ছেলেটা।

বিশ্বাস অবিশ্বাস দোলাচালে পড়ল খালিদ। জারা ফুচকার স্টলে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে। খেতে যেহেতু সময় লাগবে, ততক্ষণে দেখে ফিরে আসা যাবে। বেরিয়ে পড়ল সেও মেলার মাঠ থেকে।

সে সময়ই সানা খুঁজে পেল জারাকে। দিনার বউভাতে মেহার মাধ্যমে একবার আলাপ হয়েছিল দুজনের। তাই কথা বলতে জড়তা হলো কারোরই। সৌজন্যপূর্ণ কথাবার্তার পর সানা বের করল চিরকুটটা। জারাকে সেটা দিতে দিতে বলল, "হাসিবের আপু হই আমি। জানাল আজ তোমার ব্যাপারে। ও খুব লাজুক তো, তোমাদের সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছিল খুব। তাই চিরকুট পাঠাল আমার হাত দিয়ে।"

"ভাবা যায়? চিরকুট!" দারুণ অবাক হলো জারা। বলল, "এত লাজুক স্বভাব তো এখন মেয়েদেরও হয় না, আপু।"

"সত্যিই হয় না", মুচকি হেসে বলর সানা, "ছোটোবেলা থেকেই মুখচোরা ও। কিন্তু তোমাদের ফ্রেন্ডশিপ হলো কী করে?"

জারা নিঃশঙ্কোচেই জানাল পরিচয় হওয়ার গল্পটা থেকে বাকি সবটাই। যেহেতু হাসিবের আপু সে। সেসব কথাতেই সানা বুঝল জারার মনের ভাব। না, সত্যিই জারার মধ্যেও প্রেমের কোনো ইশারা ইঙ্গিত নেই। তাই আশ্বস্ত হয়ে বলল, "হাসিব স্টুডেন্ট হিসেবে খুবই ভালো। ছেলেটাও বেশ ভদ্র। ভুল বুঝো না ওকে। ও সত্যিই মেয়েদের সঙ্গে খুব একটা মিশতে পারে না। সেখানে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে জেনে অবাক হয়েছি। ও বোধ হয় আছে আশেপাশেই। যদি সমস্যা না হয় তো চাইলে গিয়ে কথা বলতে পারো।"

"ঠিক আছে, আপু", মিষ্টি করে হাসল জারা।

দু ভাই-বোনের চেহারাতে একটু আধটু মিল থাকলেও স্বভাবে মনে হলো সানার, শারফানের একেবারে বিপরীত জারা। শারফান যতটা তেতো, জারা যেন ততটাই মিষ্টি।

★★★

চিরকুটটা হাতে নিয়ে জারা মেলা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সানার মুখে হাসিবের প্রশংসা শুনে রাগটা পড়ে গেছে। ছেলেটা গত দু মাসে পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক সাহায্যই করেছে ওর। এজন্যই দেখা করার আগ্রহটা একটু বেশি। স্টেডিয়ামের বাইরে সামনের দিকটাই ভালোই মানুষজনের আনাগোনা। আর হাসিব আছে স্টেডিয়াম থেকে কিছুটা দূরে। এদিকটা চেনাজানা আছে জারার। তাই হাসিবের বলা জায়গায় পৌঁছতে সময় লাগল না ওর। তবে এদিকের রাস্তাটা এখন একটু নিরিবিলি। দু-চারজন করে যাতায়াত করছে। রাস্তার পাশেই একটা কালো গাড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল হাসিবকে। তার কাছে এসেই জারা দিল এক ধমক, "ছেলে মানুষ এমন হয়?" তারপরই শুরু করল দ্বিতীয় দফার বকুনি, "কী হত রেখাদের সঙ্গে দেখা করলে? ওরা কী আনস্মার্ট মনে করল তোমাকে, জানো? সানা আপু না বললে তো আসতামই না আমি।"

চোখদুটো লাল হাসিবের। বাঁ গালটাও লাল তার— শক্ত হাতের থাপ্পড় পড়লে যেমন লাল হয়। হাত-পাও কাঁপছে তার অনবরত। রাগে আর বিরক্তিতে সেসব খেয়াল করল না জারা। সানা আসলে ভুল চিনেছে ওকে। মেজাজ কিছুটা ভাইয়েরই মতো পেয়েছে সেও। আচ্ছামতো ধমকানি আর বকুনি দিতে থাকল সে হাসিবকে। ঠিক তখনই ষণ্ডামার্কা এক বিশাল দেহী লোক এসে দাঁড়াল ওর পেছনে। তাকে দেখতে পেয়েই হাসিবের গলা-বুক শুকিয়ে গেল। রক্তশূন্য হয়ে গেল মুখটা। জারা তার চেহারা আর দৃষ্টি লক্ষ করে বকাঝকা থামিয়ে ভ্রু কুঁচকে পেছনে মুড়ল আর চোখের পলকেই ওর নাকে এসে লাগল পানি। সেটা আদতে ক্লোরোফর্ম স্প্রে। গাড়ির দরজা খুলে গেছে এর মাঝেই। হাসিবকে খুনে চোখদুটোর ইশারায় গাড়িতে উঠতে বলল ভয়ঙ্করদর্শন লোকটা। কোনো কথা না বলে উঠে পড়ল হাসিব। চেতনা হারিয়ে লোকটার গায়ে পড়ে আছে জারা। আশেপাশে ভালোভাবে দেখে নিয়ে ওকেও তুলে দিল ভেতরে—হাসিবের পাশেই। ভেতরে আরও একজন ছিল। সে হাসিবকে ডিঙিয়ে গিয়ে বসল জারার অপর পাশে।

মহাসড়কে উঠে পড়ল গাড়িটা। তারপর চলতে শুরু করল দ্রুতই। পকেটে ফোনটা ভাইব্রেট করছে হাসিবের। কিন্তু বের করে দেখার সাহস নেই তার। কলটা করছে সানা। ওদের দুজনকে খুঁজছে সে মেলার মধ্যে।

নির্বাচনের দিন পনেরো আগে শারফান প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে ঝামেলাটা করিয়েছিল ফারনাজের। ঠিক সেদিন থেকেই ওকে জব্দ করার রাস্তা খুঁজে বের করেছিল ফারনাজ। একটু খোঁজ নিতেই জেনে গিয়েছিল বোনের প্রতি ওর ভীষণ সযত্ন আচরণ। জারাকে ফাঁদে ফেলার মতো চকলেট বয় ধরনের ছেলের অভাব নেই। কিন্তু সে বেছে নেয় হাসিবকে। তার প্রধান কারণ, ছেলেটা অত্যন্ত সরল আর ভীতু। হাসিবের পরিবারকে সাহায্য সহযোগিতা বেশি করে থাকেন কবির সাহেবই। যেহেতু তিনি বিত্তবান ছিলেন। এমনকি হাসিবের বোনের বিয়ের পাত্র যোগাড় করা থেকে বিয়ের যাবতীয় খরচার বেশিটাই তিনি দিয়েছেন। ছেলে প্রবাসী। আসবে এ মাসের শেষেই। তারপরই বিয়ে। ফারনাজ হাসিবকে কাজে লাগানোর সুযোগটা পেয়েছে এখানেই। যেদিন শারফানের হাতে আহত হলো সে, সেদিনই হুমকি দেয় হাসিবকে—জারাকে প্রেমের ফাঁদে না ফেলতে পারলেই বোনের বিয়েটা ভাঙবে সে। এতে কত বড়ো ক্ষতি হবে তার বোনের, তা ভেবেই হাসিব ভয় পেয়ে যায় এবং রাজিও হয় শেষমেশ। কিন্তু আজকের আগ পর্যন্তও সে জানত না জারার জন্য আসলে কী পরিকল্পনা ছিল ফারনাজের। প্রেমের ফাঁদে না ফেলতে পারলেও হাসিব জারার বিশ্বাসটা অর্জন করেছে দেখেই খুশি ফারনাজ। তার বিশ্বাসটাকে ব্যবহার করেই তো পেল জারাকে হাতের মুঠোয়।

কান্নাটা বহু কষ্টে আটকে রেখেছে হাসিব। জেনে-বুঝে জারার ক্ষতি হতে দিতে বিবেকে বাধছিল বলেই ওই অজানা আততায়ী লোকটাকে অনুরোধ করেছিল অপহরণ না করতে। তখনই কঠিন থাপ্পড়টা খেতে হয় তাকে।

গাড়িটা থামল মধুখালীর দিঘলিয়াতে—নিরিবিলি পার্কটার সামনে। “ওই নাম”, সামনে থেকে আততায়ী লোকটা হঠাৎ ধমকে উঠল হাসিবকে, “চুপচাপ ঢাকার গাড়িতে উঠে পড়বি। তোর পলায় থাকার ব্যবস্থা করা শেষ। কারও কাছে মুখ খুললেই তোর জান নিয়ে নেওয়ার পারমিশন আছে আমার।”

শেষবার জারাকে দেখে নেমে পড়তে বাধ্য হলো হাসিব। জিজ্ঞেস করতেও সাহস পেল না কোথায় নিয়ে যাবে তারা জারাকে।

★★★

সন্ধ্যা ৬ টা

টেবিল থেকে উঠে কেবিনের ডিভানে এসে গাটা এলিয়ে দিল শারফান। দুই অফিস এক সাথে সামলাতে গিয়ে আজকে দুপুরের খাওয়ার কথায় ভুলে গেছে সে, তা এতক্ষণে মনে পড়ল ওর। খাবার আনার জন্য বাপের ব্যক্তিগত সহকারীটাকে পাঠানো হয়েছে ইতোমধ্যে। তার ফেরার অপেক্ষায় আছে সে। এই অপেক্ষার মাঝেই আচমকা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন শাফিউল সাহেব। "ও শায়াফ", উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলেন, "জারাকে নাকি খুঁজে পাচ্ছে না খালিদ।"

"কী?" চমকে গিয়ে লাফিয়ে ওঠার মতো দাঁড়িয়ে পড়ল শারফান।

"তোর বন্ধুগুলোকে জলদি বল স্টেডিয়ামে যেতে", অস্থির গলায় বললেন শাফিউল, "চারপাশে খোঁজ লাগা।"

"বানি স্টেডিয়ামে গেল কখন?" ধমকে উঠল শারফান।

অসহায়ের মতো দেখাল শাফিউল হকের মুখটা। মেয়ের বায়না রাখতে গিয়ে ছেলের কড়া নির্দেশকে অবমাননা করে কি বিরাট ভুল করলেন? জানালেন কখন নিয়ে গিয়েছিল খালিদ। আর খালিদের ওপর ভরসা ছিল বলেই অত চিন্তা করেননি।

মাথায় ধ্বংসাত্মক রাগ চাপল শারফানের। স্থান বিবেচনাবোধ হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বাপের ওপর, "তুমি চিন্তা করলে কী করে আমার নিষেধ অমান্য করার? আমার কথার দুই টাকার দাম দিতে মন চায় না তোমার?"

"তুই তাড়াতাড়ি সাদ্দামদের ফোন লাগা, আব্বা। আমাকে পরে গালাগাল দিস।"

ফোনটা টেবিলের ওপর। ক্ষিপ্ত দৃষ্টিজোড়া বাবার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে টেবিলের কাছে যেতে পথে চেয়ার পড়ল সামনে। লাথি মেরে চেয়ারটাকে ফেলে দিয়ে ফোনটা হাতে নিল। লাগাতার কল করল অনেককেই। সব শেষে ফারনাজের ওপর নজরদারি করা ছেলেটা জানাল, ফারনাজ আজ কয়েকটা দিন একেবারেই বাড়ির বাইরে যায় না।

কথাবার্তা শেষ করে শারফান ফোনটা পকেটে পুরেই বেরিয়ে পড়ল কেবিন থেকে। স্যুটটা চেয়ারে ফেলে রাখা, বাবার পিছু ডাক, কিছুই গরজ করল না।

ঘন্টা আরেকটা পার হয়ে গেল। রাত নেমে পড়ায় গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল রাজন। ষণ্ডা মতন লোকটাই রাজন। খুনখারাবি, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী করা একটি পেশাদার দলের মূল মাথা সে। এ সময়ের বহু রাজনীতিবিদ আর বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও অপ্রকাশিত সংযোগ আছে তার। মোটা অঙ্কের কোনো কাজ হাতে পেলেই কেবল সে নিজে মাঠে নামে। যেমন ফারনাজের থেকেই গতবার পেয়েছিল শারফানকে মেরে দেওয়ার দায়িত্ব। এমন দায়িত্ব যতবার পেয়েছে ততবারই মানুষগুলোর মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধু শারফানের বেলাতেই। তাই দ্বিতীয়বার ফারনাজের কল পেলে সে চেয়েছিল শারফানকে এবার স্নাইপার শুট করতে। ফারনাজ রাজি হয়নি বলে একটু মনঃক্ষুণ্নই হয়েছে তাই। কারণ, এই প্রথম তার কাজের সুনাম নষ্ট হলো।

কুষ্টিয়ার ডাউদপুরে ঢুকল গাড়িটা। ভেড়ামারা উপজেলার একটি শান্ত গ্রাম। কিছুটা বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির। রাজনের হাত লম্বা বিধায় আস্তানা গড়ে নিতে অসুবিধা হয়নি। জারাকে বের করে ঢুকল একটা ছোটো গুদাম ঘরে। জলচৌকিতে ওকে শুইয়ে দিতেই এসে হাজির হলো আরও দুজন ব্যক্তি। এদের বেশভূষা আর চেহারাতে ভদ্রলোকের ছাপ। বয়সটা ত্রিশের মাঝে। একজন রোহান, আরেকজন দিপু। জারাকে দেখেই ওদের চোখজোড়া চকচক করে উঠল।

“একেবারে চেহারাতেই বলে দিচ্ছে বড়োলোকের রাজকন্যা”, ঠোঁট কামড়ে হেসে বলে উঠল রোহান।

রাজন কোনো জবাব দিল না। কথা মতো জারার কয়েকটা ছবি তুলে পাঠাল ফারনাজের কাছে। তারপরই কল লাগাল তাকে। শোবার ঘরে বসে অপেক্ষাতে ছিল ফারনাজ। রিসিভ করতে তাই দেরি করল না, “বলো, রাজন।”

“মাল নিয়ে পৌঁছে গেছি।”

“তোমার ডিউটি আবার মাঝ রাতে। ফরিদপুর মাগুরা হাইওয়ের কোনোখানে ওকে ফেলেই চলে যাবে। ফোনের স্পিকার লাউড করে রোহানকে দাও।”

রাজন বেশ চুপচাপ প্রকৃতির। সে হলো কথা কম, কাজ বেশি ধরনের মানুষ। ফোনটা নীরবেই এগিয়ে দিল রোহানকে। কানে ধরে রিহান লম্বা করে সালাম জানাল ফারনাজকে। সালামের জবাব দিল না ফারনাজ। সরাসরি বলল, “হাতে সময় কম তোর। শারফান পাগলা কুত্তার মতো হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। শুঁকে শুঁকে পৌঁছে যেতে পারে। ভরসা নেই। ঝটপট কাজ শুরু করে দে। ছেলে রেডি আছে তো?”

“হ্যাঁ, ছেলে তো পুরাই নায়ক”, বলতে বলতে দিপুর পিঠ চাপড়ে তার ঘাড় জড়িয়ে ধরল রোহান। “তুমি কোনো চাপ নিয়ো না, বস। ছবি, ভিডিয়ো, সব হবে একের।”

“দেখার পরই বুঝব তা। শেষ একটা কথা মাথায় রাখ। নুডিটি বোঝা যাবে স্রেফ। তার মানে এই না একেবারে ন্যাকেড করতে হবে মেয়েটাকে। আর এর চেয়ে বেশি চিন্তা যেন মনেও যেন না আসে। আসলেও বাড়াবাড়ি কিচ্ছু করবি না—আই অ্যাম ওয়ার্নিং ইউ। রাজনকেও একই ওয়ার্ন করছি।”

তাচ্ছিল্যপূর্ণ হাসল রোহান, “মেয়ে তো এমনিই বদনাম হবে। তাহলে কী এসে যায়?”

“কী এসে যায় সেটার কৈফিয়ত তোকে দেব না”, ধমক লাগাল ফারনাজ। “আমার কথার নড়চড় হলে বাকি পেমেন্ট কেউ পাবি না। ছবি আর ভিডিয়ো নিতে এক ঘন্টা সময় লাগারও কথা না। কাজ দ্রুত শেষ করে আমাকে জানা।” ফোনটা কেটে দিল তারপরই।

হোয়াটসঅ্যাপে জারার ছবিটা বের করে ওকে দেখতে থাকল নিষ্পলক। “সম্পদ, টাকা চাইলেই আবার তৈরি করা যায়”, স্বগতোক্তি করে উঠল হঠাৎ ছবিটা দেখতে দেখতেই, “কিন্তু ইজ্জত একবার গেলে কি ফিরে পাওয়া যায়? আমাকে ভাতে মারলি, শারফান। আর আমি মারব হক পরিবারের সুনামে, তোর সম্মানে। নাইবা ক্ষমতা থাকল তোর প্রতিপত্তি ধ্বংস করার। যে অহংকার, যে দাপট নিয়ে ঘুরিস। আজকের পর তা দেখাস দেখি!”

জ্ঞান ফেরার মুহূর্তেই কম ডোজের কেটামিন পুশ করে দেওয়া হয়েছে জারাকে। এখন সে জেগেই। চোখের পাতা আধ খোলা, দৃষ্টি ঝাপসা, কন্ঠ রুদ্ধ। আর শরীরটা যেন কাঠের পুতুল। শুধু বুকের হালকা ওঠানামা জানান দিচ্ছে—সে এখনো জীবিত।

ওড়না আর মাথার হিজাবটা খুলে নিল রোহান। খোঁপা করা চুলগুলোও খুলে দিল। পরনের ফ্রক জামাটার পেছনের চেইনটা টেনে নামিয়ে আনল বুকের মাঝামাঝিতে। ভেতরের ইনার তাতে অনেকটাই বেরিয়ে পড়ল। রোহানের কামুক চোখদুটো সেখানে পড়তেই

হাত নিশপিশ করল ওকে ছোঁয়ার জন্য। শেষ পর্যন্ত ফারনাজের হুকুম সে মানবে কিনা সন্দেহ—ভাবল দিপু। আর রোহান হুকুম পালন না করা মানেই তারও সুযোগ। রাজন গেছে আপাতত বাইরে। বলে গিয়েছিল সে ফেরার পর যেন কাজ আরম্ভ করে ওরা। কিন্তু রোহানের যে আর তর সয়নি।

"মামা, শুইয়া পড়ি?" চোখে লালসা আর মুখে বিকৃত রসের হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করল দিপু।

খিকখিক করে হাসল রোহান, "তলপেটের নিচে লম্ফঝম্প শুরু হয়ে গেছে, ভাগনা?"

একইভাবেই হাসতে থাকল দিপু জারাকে দেখতে দেখতে। রোহান বলল, "ক্যামেরা রেডি করি। ততক্ষণে তুইও রেডি হয়ে যা।"

গায়ের শার্টটা দ্রুত খুলে ফেলে দিপু শুয়ে পড়ল জারার কাছে। দিপু বয়সে তেইশ-চব্বিশের হলেও শরীরটা বিশাল। দেখলে মনেই হয় না ভার্সিটি পড়ুয়া ছেলে সে।

ক্যামেরা প্রস্তুত। শুরু হলো রোহানের নির্দেশনা। জারাকে পুতুলের মতোই যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে ব্যবহার করছে দিপু। নিজের সঙ্গে ওকে মিশিয়ে নিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে শরীরের যেখানে-সেখানে। প্রেমিক-প্রেমিকার মতোই ভঙ্গিমাগুলো দেখানো হচ্ছে ভিডিয়োতে।

রোহানকে বলা যায় চতুর ভিজ্যুয়াল কারিগর। ছবি তোলায় পটু আর ভিডিয়োতে জাদুকর। ডিজিটাল খেলোয়াড় বা ডিপফেক শিল্পীও বলা যায় তাকে। যে ছবি বা ভিডিয়োতো সত্য আর ভ্রমের তফাতটুকু মুছে দিতে পারে অনেকটাই নিখুঁতভাবে। কিন্তু এত দারুণ দক্ষতাকে সে ব্যবহার করত নোংরা কাজে। পেশাতে ছিল সে অতীতে অশ্লীল ভিডিয়ো ব্যবসায়ী। তার সেই ব্যাবসাতে থাবা বসিয়েছিল ফারনাজ। তারপরই ফরিদপুর ত্যাগ করে ঢাকায় পাড়ি জমায় সে। কিন্তু তবুও ফারনাজকে পিছু ছাড়াতে পারেনি। যার জন্য বাধ্য হয়ে এখন এক বিবাহ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে ক্যামেরাম্যানের দায়িত্বে। আজ হঠাৎ করে সেই ফারনাজের থেকেই এমন এক প্রস্তাব পেয়ে নিজেকে বহুদিন পর সুখী লাগছে তার।

★★★

রাত ৮: ২০ মিনিট
বাসের একদম পেছন সিটে বসে আছে হাসিব। মুখটা ঢেকে কান্নাকাটি করছে সে। ফারনাজের ব্ল্যাকমেইলিং তাকে তো বিপদে ফেলেছেই, তার পরিবারকেও হয়ত ভুগতে হবে। এ আশঙ্কা আর জারাকে বিপদে ফেলার জন্যই গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে যেতে ইচ্ছা করছে তার। ফারনাজ যতই বলুক পরিবারের খেয়াল সে একশোভাগ রাখবে। কিন্তু তবুও মনটা তার মানছে না। নিজের বোনের সঙ্গে আজ কেউ এমন করলে কী করে সহ্য করত সে? কথাটা ভীষণভাবে আঘাত করছে তার হৃদয়ে।

চোখদুটো মুছে মিনিট দুই ভাবল কিছু একটা। অ্যানড্রোয়েড ফোন কেনার আগে একটা বাটন ফোন কিনেছিল সে। খুব গোপনে সেই ফোনটা গাড়ির সিটের ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে এই ভেবেই, যদি জারার হাতে পড়ে কোনোভাবে? কিন্তু এখন আরও একটা চিন্তা মাথায় এল তার। নাম্বার দিয়ে নাকি কী করে যেন জায়গা চিহ্নিত করে পুলিশেরা! সে যদি জানিয়ে দেয় জারার বাড়িতে, তাহলে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে ওকে যেখানে রাখা হয়েছে। হ্যাঁ, তাই-ই করবে সে। কিন্তু জানাবে কাকে? জারার ফোন নাম্বার জানা আছে। কোনোদিন ফোন করার সাহস হয়নি। কারণ, তাকে জানানো হয়েছিল ফোনটা সব সময় ওর মায়ের কাছেই থাকে। এখনো নিশ্চয়ই থাকার কথা? ফোন করে বলার মতো বুকের পাটা তার নেই। তাই মত বদল হওয়ার আগে জারার ফোন নাম্বারে ঝটপট মেসেজ করল একটা। উল্লেখ করল না ফারনাজের কথা, আর না নিজের পরিচয়। কেবল ঘটনার মূল বর্ণনা রাখল, নিজের ফোনটার কথা নাম্বারসহ জানাল আর রাজনের গাড়ির নাম্বারটাও

লিখল। গাড়ি থেকে নামার পর বুদ্ধি করে এটাও মুখস্থ করে নিয়েছিল সে। তবে তখনো ভাবনায় ছিল না এভাবে সবটা জানাবে সে জারার পরিবারকে।

মেসেজটা পাঠানোর পর ভয় আর দুশ্চিন্তার মাত্রা কমল না হাসিবের। বরং বাড়ল। যদি ফোনটা না থাকে কারও হাতে? থাকলেও যদি তাও খুঁজে না পায় জারাকে? আর যদি মেসেজটা কেউ দেখে তাহলে কি তার ফোন নাম্বারের মাধ্যমে তাকে খুঁজে নেবে? খুঁজে পেলে তাকে কী করবে জারার পরিবার? এসব ভেবেই সিমকার্ডটা আচমকা খুলে জানালার বাইরে ছুঁড়ে মারল সে

রেখা আর অনিমা—জারার বান্ধবী দুজন। এই মুহূর্তে জারার বাসার লিভিংরুমে বসে আছে ওরা। সাথে আছে তাদের অভিভাবকও। সাদ্দাম আর রিপন তাদেরকে পরোয়া না করেই চড়া গলায় জেরা করে যাচ্ছে মেয়ে দুটোকে। আশ্চর্যের বিষয়, ভয়ে কান্নাকাটি করলেও হাসিবের নামটা ওরা কোনোভাবেই মুখে আনছে না। ওরা আসলে বিশ্বাস করে জারা আর হাসিব প্রেমের সম্পর্কে ছিল। কিন্তু তা কখনো জারা ওদের কাছে স্বীকার যায়নি। এবং আজ ওরা পালিয়ে গেছে। আর পালিয়ে যাওয়ার জন্যই জারা অমন মরিয়া হয়ে আজ মেলায় গিয়েছিল। কেননা হাসিব গরিব বিধায় কখনো তাকে মেনে নেবে না জারার বাবা, ভাই। এখানে ওদের আসল ভয় হলো, হাসিবের কথা বললে সবাই যদি ভাবে জারাকে পালাতে সাহায্য করেছে ওরাই? তাই দুজন আগে থেকেই পরামর্শ করে সবটা গোপন করে যাচ্ছে।

"তোমরা যদি কিছু লুকিয়ে থাকো এখনো সময় আছে সব বলার", কঠোর হয়ে বলল সাদ্দাম, "জারার ভাই আসছে। সে এসে যদি ধরে তোমাদের আর যদি বুঝতে পারে তোমরা মিথ্যে বলছ। তাহলে কিন্তু ও কাউকেই মানবে না তোমাদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে।"

কথাটা শেষ করার পরই জারার ফোনটা বেজে উঠল এক মুহূর্তের জন্য। জেসমিন বেগমের হাতে ফোনটা। কান্নাকাটি করতে করতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে সামলাচ্ছে জোবেদা আর জারার বান্ধবীর মায়েরা। ফোনটা চেক করা হয়ে গেছে সাদ্দাম আর রিপনের। দুর্ভাগ্যক্রমে জারার দ্বিতীয় অ্যাকাউন্টের হদিসটা জানতে পারেনি ওরা। কারণ, কাজ হওয়ার পর ভাইয়ের ভয়ে অ্যাকাউন্টটা ফোনেই রাখত না সে। মা কিছু না বুঝলেও সদা সতর্কতা অবলম্বন করত।

সোফার হাতল থেকে মাথা তুলে ভেজা চোখে ফোনের স্ক্রিনে তাকালেন জেসমিন বেগম। ঝাপসা চোখে কিছু বুঝলেন না। ততক্ষণে সাদ্দাম উঠে এসেছে ফোনটা দেখার জন্য। তিনি তুলে দিলেন ওর হাতেই।

হাসিবের মেসেজ! মেসেজটা পড়তে পড়তেই উত্তেজনায় হাত কেঁপে উঠল সাদ্দামের। দ্রুত সেটা ফরোয়ার্ড করল শারফানের কাছে, শাফিউল সাহেবের কাছেও। হাসিবের নাম্বারটাও মেসেজ করল তাদের। তারপরই কল লাগাল শারফানকে।

জ্যামে আটকে বসে থাকতে হবে বলে শাকিবুল সাহেবের গাড়িটা নিয়েছে শারফান। যাতে এমপির গাড়ি দেখেই ট্রাফিক পুলিশ বেরিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। শাকিবুল সাহেব সরাসরি ওপরমহলে জানিয়ে রেখেছেন—জ্যামে যেন আটকে না পড়ে তার গাড়ি। প্রয়োজনে রুট ফাঁকা করে দেওয়ারও অনুরোধ করেছেন।

এই মুহূর্তে তাই ফেরি ঘাটে শারফান। সঙ্গে শাফিউল সাহেব আর রিহানও। কলে ইতোমধ্যে এসবির সহকারী পুলিশ সুপারের সাথে কথা চলছে ওর। তদন্তে নেমে পড়েছে তারা। কথার মাঝেই সাদ্দামের ফোন ঢুকল। কথা শেষ করে তার ফোন ধরল শারফান। জিজ্ঞেস করল, "নতুন কোনো আপডেট?"

"মেসেজ দেখ ফাস্ট।"

কলটা কেটে দিয়ে ইনবক্স চেক করল শারফান। মেসেজ দেখেই হৃৎস্পন্দনের গতি বেড়ে গেল ওর। সঙ্গে সঙ্গেই মেসেজদুটো ফরোয়ার্ড করল এএসপিকে। তারপরই কল করল তাকে। রিসিভ হতে ঝড়ের গতিতে নির্দেশ দিল, “ডোন্ট ওয়েস্ট আ সেকেন্ড। পিনপয়েন্ট দ্য ফোন’স লোকেশান অ্যান্ড লোকেট দ্য ভিয়াকল—রাইট নাও।”